বাস্তুসাপ

ঋতুপর্ণা কোলে

দশ দিন পর ফিরবে মেয়েটা। শেষ চারদিন তো কথাটুকুও হয়নি। সারাদিন অধীর অপেক্ষায় থাকার পর রাতেরদিকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ আসতো "ঠিক আছি। চিন্তা কোরো না"। কাল রাত্রে জানালো "বাড়ি ফিরছি"। বন্ধুর সঙ্গে যাচ্ছে, বন্ধুর বাবা সব ব্যবস্থা করেছে, চিন্তার বিশেষকিছু আছে বলে তখন মনেও করেনি তিন্নির মা। তিন্নির বাবার খুব রাগ যে মেয়েটা এমন হয়েছে কেবল এই মায়ের আশকারাতেই। কদিন ধরে খবরে যা সব দেখছে তাতে ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। তার উপর ওইসব ঝামেলায় ফেঁসে গেল। ছায়াও এখন নিজেকে দোষী ভাবছে। ভাবছে, আটকাতেই তো পারতো।

সুবিনয় ভাবছে, তিন্নির বয়সের সব মেয়েরা বিয়ে করে বেশ তো সংসার গুছিয়েছে। আচ্ছা সংসার না করুক পড়াশুনা তো করতে পারে? পড়াশুনায় যে খুব খারাপ তা তো নয়। হঠাৎ করে মাথায় চাপলো বাংলাদেশ যাবে। তাতেও মা জানিয়ে দিলো "আচ্ছা যাও"।

-"তুমিই বা কোন আক্কেলে পারমিশন দিলে?"

-তোমার মেয়ে আজ পর্যন্ত কোন কাজের পারমিশন চেয়েছে? বাধা দিই না বলেই জানতে পারি কী করছে না করছে। বাধা দিলে তো জানতেই পারতাম না কিছু। চলে যেত।

-মানে? কী বলতে চাইছো তুমি?

- ওর জেদ তুমি জানো না?

- এই তোমার জন্যেই মেয়েটা এত অবাধ্য হয়েছে।

সুবিনয় এটা বলেই কেমন যেনো মিইয়ে গেলো। এরপর কোন বাণ তার দিকে তেড়ে আসছে তা অজানা নয়।

কিন্তু ছায়া কিছু বললো না। একবার তাকালো মাত্র। সুবিনয় মাথা নামিয়ে নিলো।

মেয়ে তিন্নিকে নিয়ে এভাবেই চলে ছায়া আর সুবিনয়ের সংসার। বাড়িতে আর একজন আছেন তিনি হলেন তিন্নির ঠাকুমা। এককালে ভয়ানক দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে আজ একেবারেই

নিভন্ত প্রদীপ। মানে জ্বলছে তো বটেই কিন্তু কোনো তেজ নেই। আছেন সেটা তার দিকে তাকালে তবেই বোঝা যায়।

২

বাসের জানালার ধারের সিটটাতেই বসলো তিন্নি। তারপাশে ঝিলিক। কিন্তু দুজনের মুখেই অদ্ভুত নিঃস্তব্ধতা। কথা নেই কারো মুখেই। বাস ছাড়লো ঢাকা থেকে। তিন্নি বারবার জানালা দিয়ে ফিরে ফিরে দেখছে। তারপর একসময় ঝিলিকের কাঁধে মাথা রাখলো। ঝিলিক ওর কাঁধটা ভেজা অনুভব করলো। বুঝতে পারলো তিন্নি কাঁদছে। তবুও ঝিলিক চুপ করেই থাকলো। কোনো একটা ব্রীজের উপর দিয়ে যাচ্ছে বাসটা। অন্ধকার হলেও পূর্ণিমার আলোয় বোঝা যাচ্ছে। গলাটা শুকনো অনুভব করলো ঝিলিক। হাতের কাছেই বোতলটা ছিলো জলটা মুখে দিয়ে ভাবলো তিন্নিও তো অনেকক্ষণ জল খায়নি। দুবার ডাকলো, "অ্যাই তিন্নি। তিন্নি... জল খাবি?" সাড়া না পেয়ে বুঝলো ঘুমিয়ে গেছে। একবার কাকিমাকে ফোন করা দরকার ভেবেই মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখলো কাকিমার মেসেজ। কাকিমা মানে তিন্নির মা। লিখেছে, "উঠেছিস বাসে? সব ঠিক আছে তো?" ভালোই করেছে মেসেজ করে। এখন কথা বলতেও ভালো লাগছে না ওর। লিখে দিলো, "হ্যাঁ কাকিমা সব ঠিক আছে। তুমি ঘুমিয়ে যাও। কাল দেখা হচ্ছে"।

এই কদিনে তিন্নি অদ্ভুত বদলে গেছে। কাকিমা ফোন করলেই রেগে যায়। কেবল কাকিমা নয় যে কেউ ফোন করলেই রেগে যাচ্ছে। মেয়ে বাইরে আছে। একের পর এক বিপদ লেগেই আছে। চিন্তা তো হয়। তিন্নিকে না ঘাঁটিয়ে কাকিমা ঝিলিক-কেই ফোন করে খবর নেয়।

কাকিমা বেশ বোঝে। ঝিলিক মাঝে মাঝে ভাবে ওর মা এমন হতে পারতো তো। সারাজীবন কেবল মেয়েদের এই করতে নেই আর সেই করতে করেই করে গেলো। ঝিলিকের বাবা এব্যাপারে অনেক বেশি উদার। ওদের বাংলাদেশ যাওয়া আসার সব ব্যবস্থা ওর বাবা-ই করে দিয়েছিল। ভারত সরকারের উচ্চপদে থাকার এটুকুই সুফল।

৩

নব্বুইয়ের দশকের গোড়াতেই তখন কলেজ কাঁপাচ্ছে তৃতীয় বর্ষের সুবিনয়। কলেজ ইউনিয়নের দাদা সে। গেটের পাশেই আরও চারজন ছেলের সঙ্গে বসে আছে। আজ থেকে নতুন বছরের ক্লাস শুরু। নতুন নতুন ছেলে মেয়েদের কাছে হিরো সাজার দিন। একটা মেয়ে তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো "দাদা... বাংলা অনার্সের ক্লাসটা কোনদিকে?" পাশ থেকে অন্য

একটা মেয়ে বলে উঠলো "আর কতো দাদার দেখানো পথে চলবি? বড়ো হয়েছিস নিজের পথ নিজে খোঁজ"। বলেই মেয়েটার হাত টেনে নিয়ে চলে গেলো।

অপমানিত বোধ করল সুবিনয়ের বন্ধুরা। কিন্তু মুহূর্তে ভালো লেগে গেলো সুবিনয়ের। মেয়েটা কে? এত তেজই বা কীসের? নতুন জায়গায় এসে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। খোঁজ নিয়ে জানলো মেয়েটির নাম ছায়া বিশ্বাস। ইতিহাসের অনার্সে ভর্তি হয়েছে, বাড়ি নদিয়ার কোথাও একটা। কলকাতার একটা মেসে থাকছে। সুবিনয় নিজেও ইতিহাসের ছাত্র সঙ্গে বাম নেতা। ব্যাপারটা আপাতত এখানেই থেমে যেতে পারতো কিংবা গিয়েও ছিল ছয়মাসের জন্য। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জানা গেল কলেজে ফেস্ট হবে। প্রতি ডিপার্টমেন্ট কোনো একটা বিষয়ের উপর প্রোজেক্ট তৈরী করে স্টল দেবে। তার মিটিং ৩টে নাগাদ যারা স্টলের ব্যাপারে আগ্রহী তারা যেন অবশ্যই মিটিং-এ থাকে। প্রথম বর্ষের তেমন কেউ আগ্রহ দেখালো না। মিটিং-এর আগেই ক্লাসে একটা ছোট মিটিং হয়ে গেল। ঠিক হলো দাদা দিদিরা যা ঠিক করার করুক প্রয়োজন মতো তারা সবাই কাজ করে দেবে। তিনটেয় মিটিং শুরু হলো। ছায়া গিয়ে হাজির। সুবিনয় তখন বক্তৃতা দিচ্ছে। প্রোজেক্টের বিষয় দেশভাগ। সুবিনয় বলে চলেছে একই মায়ের দুই সন্তানকে কীভাবে আলাদা করা হয়েছে, কীভাবে সম্প্রীতি নষ্ট করা হয়েছে, আজ যদি দুই বাংলা এক থেকে আলাদা রাষ্ট্র করতো বাঙালি ভাগাভাগি হতো না, ভারত রাষ্ট্রর অংশ হওয়ার থেকে বৃহত্তর বাংলাদেশ হলে কত ভালো হতো ইত্যাদি। হাততালির বন্যা বয়ে যাচ্ছে। ছায়া দাঁড়ালো। সুবিনয়কে থামিয়ে প্রশ্ন করলো, "জানেন সংখ্যাটা? পুরো বাংলাটাই গেলে কোথায় পালাতেন? বিহার? নাকি বাঁচাতে তুলে নিয়ে যেত আপনার ওই চীনের দাদারা?"

-কী বলতে চাইছেন?

-সম্প্রীতি মারাবার আগে গোটা পৃথিবীর ইতিহাস খুলে দেখুন যেখানে ইসলাম সংখ্যাগুরু সেখানে সংখ্যা লঘুর পার্সেন্টেজ। ইতিহাসেরই ছাত্র তো আপনি? প্রোজেক্ট করতে হলে সত্যিটা তুলে ধরুন।

-কোনটা সত্যি?

-এই যে আমি মূর্তিমান সত্যি। আমার পরিবার সত্যি। আমার দাদু, ঠাম্মা, জেঠু চাপাতির ঘায়ে মৃত। এক পিসি কোথায় আছে জানি না। পনেরো বছর বয়সের একটা মেয়ে পেটের মধ্যে না জানি কার বাচ্চা নিয়ে দেশ ছাড়ে। ছাড়ার আগে আমার বাবার সঙ্গে তার বিয়ে হয় পথে কেবল বাঁচার তাগিদে। সেই পেটের বাচ্চাটা আজকের আমি"। আরও জানতে চান?

সুবিনয় কেমন যেন থমকে গেল। থমকে গেল গোটা ঘরটা। থমকে গেল সেদিনের মিটিং।

পরেরদিন সুবিনয় কলেজে এসে প্রোজেক্টের কনভেনিয়র হিসাবে নাম ঘোষণা করলো ছায়ার। ছায়ার কাছে গিয়ে বললো, "সত্যিটা আরও জানতে চাই"।

প্রোজেক্ট তো ঠিকঠাক উতরে গেল, স্টল দেখে সবারই গলার কাছটা কেমন একটা শুকিয়ে এলো অন্যদিকে দুটো মানুষের মধ্যে বসন্তের দখিনা বাতাসের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল।

এরই বেশ কিছু বছর পর আগে সুবিনয় তার দুবছর পর ছায়া দুজনেই স্কুলের চাকরি পেয়ে গেলো এবং বিয়েটাও সেরে নিল।

৪

-অ্যাই তিন্নি ওঠ। পদ্মা সেতু পাড় হচ্ছে।

-আরে কখন ঘুমিয়ে গেছিলাম। মাকে ফোন করাও হয়নি।

-কাকিমার সঙ্গে কথা হয়েছে

-আচ্ছা। ঝিলিক!

-বল

-আজকের মতো সেদিনও কোজাগরী পূর্ণিমা ছিলো জানিস। পদ্মা নিশ্চয়ই এতটাই সুন্দর ছিলো সেদিন-ও তাই না?

ঝিলিক চুপ রইলো।

এই কদিন আগেই তো এসেছিল। মাঝে কত কিছুই না ঘটে গেল। আজ দাদুর কথা বড্ড মনে পড়ছে। শেষ সময়টা দাদু তিন্নি অন্ত প্রাণ ছিলো। যেদিন মারা গেলো তার দুদিন আগে তিন্নির হাত ধরে বলেছিলো, "আমাকে নিয়ে যাবি দিদিভাই? বোনটাকে এবারে ঠিক নিয়ে আসবো। আমার জন্য অপেক্ষা করছে দিঘিটার ধারে"।

তিন্নির মায়ের জন্মের পরই তার দিদা মারা যায়। মাত্র বাইশ বছর বয়সের গোবিন্দ ছোট্ট ছায়ার সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। ছায়া যেন সত্যিই ছায়া, গোবিন্দর ছায়া। যেদিন ছায়া চাকরি পেলো গোবিন্দর মেয়েকে জড়িয়ে সে কি কান্না। ছোট্ট ছেলের মতো মেয়ের কাছে নাকি আবদার করেছিল "এবার একবার নিয়ে যাবি?" তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছিলো ছায়া। আর কখনো মেয়ের কাছে সেদেশের কথা তোলেনি। তিন্নি যখন একটু বড়ো হলো, দাদুর কাছে

গল্পের আবদার করতে শুরু করলো তখন থেকে আবার সেদেশ নতুন করে জন্ম নিলো দাদু নাতনী কাছে। তিন্নির কাছে দাদুর বাড়ি, দাদুর গ্রাম ছবির মতো স্পষ্ট ছিলো এমনকি মানুষগুলোও। খালি গ্রামের নাম দাদু কখনো বলেনি তিন্নিকে। তিন্নির আর তার দাদুর গল্পের জগতে একটা কাদের শেখ আছে রূপকথার দৈত্যর মতো। সেই কাদের শেখের কাছে একটা বন্দিনী রাজকন্যা আছে। কিংবা আজ আর নেই। কিন্তু ওদের গল্পে কোনো রাজপুত্র নেই যে ঐ রাজকন্যাকে মুক্ত করতে পারে।

গোবিন্দ যেদিন মারা গেল সেদিন তিন্নি দাদুর কাছেই বসেছিল। দাদু একটা চাবি তিন্নির হাতে দিয়ে সামনের টেবিলের ড্রয়ারের দিকে আঙুল তুলে কী যেন দেখাতে চাইলো। তিন্নি ড্রয়ার খুলে একটা ডায়েরি পেলো। পড়ার সময় পায়নি সেদিন। দাদুর কাজ কর্ম শেষ হতে একদিন অলস দুপুরে সে তার চিলেকোঠার ঘরে ডায়ারিটা খুলে বসলো। তিন্নির তখন বয়েস সতেরো। সেই দুপুরেই তিন্নি ঠিক করেছিল যে সে যাবে দাদুর বাড়ি, দাদুর গ্রামে। কে জানে হয়তো পেলেও পেতে পারে দাদুর আদরের ছোট বোনকে।

৬

গোবিন্দ মারা গেছে বছর ছয়েক হলো। তিন্নি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম.এ করছে। গোবিন্দ মারা যাওয়ার পর ছায়ার খালি গ্লানিবোধ হয়। সে বোধ হয় সত্যিই মেয়ে হতে পারে নি। গোবিন্দ যতবারই দেশে ফিরতে চেয়েছে ততবারই আটকেছে। রেগে গেছে। আসলে ছায়াও জানে সে গোবিন্দর নিজের মেয়ে নয়। ছায়া দেশটাকে কেবল ঘৃণা নয়, ভয়-ও করে। সেখানে সেই পশুগুলো আছে যাদের অত্যাচারের ফসল সে। সেই নোংরা মানুষগুলোর রক্ত যে তার শরীরেও। তাই পালিয়ে বাঁচাটাই শ্রেয় মনে করে।

তিন্নি যখন যাবার কথা তার মাকে জানায় ছায়া কেবল বলে, “যেতে হলে নিজে যেও। আমাকে বোলো না”

সুযোগ হঠাৎ-ই আসে। ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সেমিনার। সেখানে অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক শাহরিয়ার সুমন। সেমিনারে বক্তব্য রাখলেন বাংলাদেশের উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ এবং পুনরায় পাকিস্তানের পথে যাওয়া দেশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাহিত্যের পরিবর্তনগুলি যখন তুলে ধরছিলেন, মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল তিন্নি।

সেমিনার শেষে তিন্নি দেখা করতে গেল।

-আপনার থেকে কি একটু সময় পেতে পারি।

-হ্যাঁ। বলুন।

- নমস্কার আমি তিলোত্তমা বসু।

-নমস্কার।

-আসলে আপনার সঙ্গে একটু আলাদা করে কথা বলতে চাইছিলাম। আমাকে প্লিজ 'আপনি' বলবেন না।

- আচ্ছা চলো ঐ বারান্দাটায় যাই।

বারান্দায় যেতে যেতে তিন্নি- ক্ষমা করবেন বিব্রত করলাম বলে।

-আরে না না

- আসলে আমি মানে আমার দাদু বাংলাদেশের। যতটা তথ্য পেয়েছি তা হলো নলশোধা বলে একটা জায়গায় ওনাদের বাড়ি ছিল। গ্রামটা নিয়ে জানতে ইচ্ছা করে।

- দাদুর বাড়ি নিয়ে আর কোনো তথ্য জানা আছে?

- দাদুদের পদবী ছিল বিশ্বাস। কোনো দিঘী আছে তার পাশেই বাড়ি ছিলো। বড় বাড়ি।

-আচ্ছা বেশ আমি গিয়ে খোঁজ নিচ্ছি। তোমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটা দাও। যোগাযোগ করতে সুবিধা হবে।

এরপর সপ্তাহ দুয়েক কেটে গেলো। সন্ধ্যেবেলা নিজের পড়ার ঘরে বসে একটা অ্যাসাইনমেন্ট রেডি করছে তিন্নি। এমন সময় একটা মেসেজ। স্ক্রীনে ভেসে উঠলো 'সুমন স্যার বাংলাদেশ'

-অন আছো?

- হ্যাঁ আছি। কেমন আছেন?

-একবার ফোন করতে পারি।

-হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার।

হোয়াটসঅ্যাপেই ভয়েস কল ঢুকলো।

“যতটা খবর পেলাম সেই দিনের হামলায় ওই গ্রামের কোনো হিন্দুর বেঁচে থাকার কথা নয়। তাহলে তোমার দাদু?”

-দাদু সেদিন বাড়িতে ছিলো না।

-ও বাড়িতে কাদের শেখ নামে একজনের পরিবার থাকে।

-ওই লোকটাই তো...

-হ্যাঁ জানলাম। তবে সে আর বেঁচে নেই। ওই বাড়ির একটি মেয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। মেয়েটি ভালো। আজ ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হলো। সে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। তোমার নম্বর কি দেবো?

তিন্নির সঙ্গে বন্যার কথা শুরু সেদিন থেকেই। বন্যা বারবার তিন্নিকে নেমতন্ন করে তাদের বাড়িতে। তিন্নি বুঝে পায় না কী করবে। সেদিন বন্যার মা সাবিনা যখন বললো, “এ তো তোমাদেরই বাড়ি। একবার অন্তত এসো’ তিন্নির যাওয়ার ইচ্ছা আরও প্রবল হয়ে উঠল।

৭

চতুর্থীর রাতে তিন্নি আর ঝিলিক ঢাকার ফ্লাইট ধরেছিল। তিন্নি যখন দাদুর দেশ ছাড়ার গল্প, ওর মায়ের জন্মের গল্প ঝিলিকের কাছে করেছিলো। ঝিলিকের অজান্তেই চোখের কোণ ভিজে উঠেছিলো। ঝিলিক তিন্নিকে জিজ্ঞেস করে বলেছিলো, “যাবি?”

-যেতে তো চাই। কিন্তু কীভাবে?

-বাবা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। দেখি রাজি করাতে পারি কিনা।

সত্যিই ঝিলিকের বাবা সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো।

তিন্নির খুব ইচ্ছা ছিলো ফেরাটা যেন বাসে হয়।

ঝিলিকের বাবা টিকিট, পাসপোর্ট, ভিসা সবকিছু রেডি করে ফেললো কয়েকদিনের মধ্যে। এরপর ডেকে পাঠালো তিন্নিকে। ঝিলিকের মা তিন্নির সঙ্গে সামান্য কথাটুকুও বললো না।

-আচ্ছা কাকু, তুমি আপত্তি করলে না কেনো?

- আমার মা বাংলাদেশের। মা খুব চাইতো মরার আগে একবার যদি দেখতে যেতে পারে। মায়ের জন্য ব্যবস্থা তো করতে পারিনি। ঝিলিক গেলে জানবো আমার মা গেছে। মায়ের ইচ্ছাপূরণ করতে পেরেছি।

- ও দেশ থেকে যারা এসেছে তারা এদেশকে কখনো আপন করতে পারেনি না?

- পারা কি সম্ভব? কটা ছুটি পেলেই মানুষ কেনো নিজের বাড়ি ফেরে?

-এখানে তার সব আছে। কিন্তু বাংলাদেশে তো মানুষগুলোর কিছুই নেই।

- নেই কে বললো। কেবল মানুষ দিয়েই কি দেশ হয়? দেশটাকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিলো কেউ তার দেশের মাটি স্বেচ্ছায় দান করে আসেনি। ছোট বেলায় মনে আছে তোর একটা পুতুল ঝিলিক জোর করে তোর থেকে নিয়ে চলে এসেছিলো, তুই অনেক কান্নাকাটি করেছিলি ও ফেরত দেয়নি। আমরা যখন জানলাম ফেরত দেবো ঠিক করলাম শুনো রাগে ও নোংরা ফেলার গাড়িতে ফেলে দিয়েছিলো।

-সেই পুতুলের জন্য আজ-ও ওকে কথা শোনাই।

-তাহলেই ভাব সামান্য পুতুলকে ভুলতে পারিসনি, মানুষগুলো দেশ, মাটি, মানুষ, স্মৃতি সব ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে।

-বুঝতে পারছি। আজ যখন যাওয়ার প্রস্তুতি শেষ তখন মনে হচ্ছে গিয়েই কী হবে। এতদিন যে ইচ্ছাটাকে মনের মধ্যে লালন করেছি এখন কেমন একটা দ্বিধা কাজ করছে।

- জীবনে প্রথম মা বাবাকে ছাড়া ঘুরতে যাচ্ছিস। নতুন দেশ দেখতে যাচ্ছিস। পুরনো কথা ঝেড়ে ফেলে আনন্দ করে যা।

ঝিলিকের বাবাকে প্রণাম করে তিন্নি বেরিয়ে এলো।

৮

সালটা ১৯৭০। গোবিন্দ স্কলারশিপ নিয়ে ভর্তি হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সপ্তাহ শেষে বাড়ি ফেরে। বাড়ি তার নলশোধায়। ছোট বোন কাজরি ঠিক জানে দাদার ফেরার সময়, দিঘির পাড়ে গিয়ে অপেক্ষা করে। মা, বাবা, দাদা, দিদি, বোন, চাকর-বাকর সব নিয়ে ভরপুর সংসার। গোবিন্দর দাদার বিয়েও পুজো মিটলেই অগ্রহায়ণ মাসেই।

সেদিন ছিল লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন। আসন্ন মা লক্ষ্মীকে মানে ভাবি বৌদিকে তত্ত্ব দিতে গেছিল গোবিন্দ পাশের গ্রামেই। বৌদির মা নাড়ু করেছে সেসব আর কিছু নতুন জামা কাপড় নিয়ে ফিরছিল সে। গোবিন্দদের বাড়িটা গ্রামের একপ্রান্তে। নলশোধা দিঘির গা ঘেঁষে খামার, দুর্গা দালান তারপরেই পেল্লাই দোতলা বাড়ি। দিঘির অপর দিকে যতদূর চোখ যায় গোবিন্দদের জমি। গোবিন্দ তখন মাঠের মাঝে চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে আসছে। কিন্তু কিছু না বুঝে আরও জোরে পা চালাতে লাগলো। হঠাৎ মাঠের মাঝে শেফালিকে দেখে চমকে উঠলো গোবিন্দ। গায়ে পোশাকের নাম মাত্র নেই সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে রক্তে। কাজরীর প্রাণের বান্ধবী শেফালী। একই বয়স দুজনের। তার থেকে কিছু শোনার আগে গোবিন্দ হাতের ব্যাগে থাকা তত্ত্বে আনা নতুন কাপড় তাড়াতাড়ি জড়িয়ে দিলো শেফালির গায়ে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শেফালি জানালো কাদের শেখের লোকজন গোটা গ্রামের দখল নিয়েছে। চাপাতির ঘায়ে সবারই মাথা আলাদা করে দিচ্ছে। শেফালিকে ছিঁড়ে খেয়েছে কাদের শেখের লোকজন। তারপর মরা ভেবে ফেলে পালিয়েছে। মরার মতো পড়ে থাকতে থাকতে শেফালি শুনেছে কাদের শেখ বলছে "বড় কত্তাদের ছোট মেয়ের গায়ে কেউ হাত দিবি না ওটা আমার"। কাদের শেখের লোকজন চলে গেলে শেফালি কোনো মতে গ্রাম ছেড়ে মাঠে এসে লুকায়। মাঠে লুকিয়ে থাকার সময় শেফালি দেখেছে দিঘির পার থেকে কাজরিকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে কাদের।

"দিঘির পাড়ে"?

"হ্যাঁ"

"তবে তো আমার জন্যই দাঁড়িয়েছিলো। ও জানতো আমি ফিরবো"

বলেই দৌড়ে বাড়ির দিকে যেতে যাচ্ছিলো গোবিন্দ। শেফালি কিছুতেই যেতে দিলো না। ও জানতো গোবিন্দ এই যাওয়া জীবনের শেষ সময়কে ঢেকে নিয়ে আসবে। ধান জমির মধ্যে দিনের আলো নেভা অবধি অপেক্ষা করলো। তারপর সোজা হাঁটা। থেমে ছিলো ভোরের আলো ফোটার ঠিক আগে। ঢাকায় এক অধ্যাপকের বাড়ি। যিনি গোবিন্দকে স্নেহ করতেন। মোদ্দা কথা গোবিন্দ তাই-ই জানতো। অবশ্য কাদের শেখকেও গোবিন্দ তার বন্ধু বলেই চিনেছে এতদিন। একসঙ্গে খেলা, দিঘিতে মাছ ধরা সবই তো তার করেছে। গোবিন্দর মা কাদেরকে নিজের ছেলেদের থেকে আলাদা করে কখনো দেখেনি। কিন্তু হঠাৎ কীভাবে সব যেন বদলে গেল।

-স্যার স্যার দরজা খুলুন স্যার। (বারবার দরজায় কড়া নাড়লো গোবিন্দ)

-(ঘুম চোখে দরজা খুলে) আরে গোবিন্দ যে... একি অবস্থা তোদের। আয় আয় ভেতরে আয়।

ভেতরে যেতেই আগে জামা কাপড় তোয়ালে দিলেন গোবিন্দর স্যার। বললেন, "আগে ফ্রেশ হয়ে আয়"। শেফালিকে নিয়ে গেল স্যারের স্ত্রী ভেতরের ঘরে। গোবিন্দ জামা কাপড় ছেড়ে স্যারের কাছে বসলো। সব জানালো

-স্যার কটা দিন শেফালিকে রাখবেন? আমি একটা কাজ জুটিয়ে ওর জন্য থাকার ব্যবস্থা করবো।

-এই দেশটা তোদের জন্য সেফ নয় রে। তারচেয়ে তোরা ইন্ডিয়া চলে যা না... আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো কোনো সমস্যা হবে না।

-এটা কী বলছেন?

গোবিন্দ কেমন যেন পাথরের মতো হয়ে গেলো আর কথা বাড়াতে পারলো না। সন্ধ্যা নামার আগে একটা গাড়ি এলো। স্যারের নির্দেশ মতো শেফালি আর গোবিন্দ চেপে বসলো। দুজন সদ্য পরিবার হারা, দেশ হারা মানুষ চললো ছিন্নমূল হতে।

গাড়ি ছাড়ার আগে স্যার গোবিন্দর হাতে একটা কাগজ আর তাতে মুড়ে কিছু একটা দিলেন। গোবিন্দর কানের কাছে বললেন, "কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবি শেফালি তোর স্ত্রী"। এই কথাতেই শেফালি আর গোবিন্দ স্বামী-স্ত্রী। আলাদা করে আর কোনো বিয়ের প্রয়োজন হয়নি তাদের। বলা ভালো সুযোগ-ও হয়নি।

গোবিন্দ নিরুত্তর রইলো। সে ভেবে পাচ্ছিলো না কৃতজ্ঞ হবে নাকি? লোকটার কাছে গোবিন্দ এসেছিল দেশের মাটিতে একটু নিরাপত্তা পেতে। লোকটা একটা আঙটি আর এক চেনের বিনিময় দেশত্যাগের ব্যবস্থা করে দিলো, দেশটাকেই কেড়ে নিলো। কাদের শেখের সঙ্গে কি কিছুমাত্র ফারাক আছে? কাদের অশিক্ষিত তাই নির্মমভাবে কাড়ে ও মারে। স্যার শিক্ষিত তাই সব ছিনিয়ে নেন হাসিমুখে, কিছু দানাপানি দিয়ে।

৯

তিন্নিদের নিয়ে গাড়ি ছুটলো ঢাকা থেকে নলশোধা। বন্যা ওর বাবাকে নিয়ে এসেছে এয়ারপোর্টে। শহরটা ছাড়ানো মাত্রই একটা অদ্ভুত স্নিগ্ধতা, নির্জনতায় মোড়া। কেবল সবুজ আর সবুজ। শরতের প্যাঁজা তুলোর মতো মেঘগুলো ছায়াপথের দুপাশের দুই বিরাট বিরাট

জলাশয়ের মেঝেতে খেলা করছে। "এগুলো কি সোনাই, রূপাই ঝিল"? প্রশ্ন করে উঠলো ঝিলিক। গাড়ির জানালার কাঁচে মুখ রেখে দিগন্তে হারিয়ে গেছিলো তিন্নি। ঝিলিকের প্রশ্নে চমকে উঠলো।

-আরে দাদুর ডায়ারিতে ছিলো না? সোনাই রূপাই ঝিলের পাড় থেকে দাদুকে বাস বদলাতে হত।

- হ্যাঁ তো... ইশ... কীভাবে ভুলে গেলাম... ওই তো ওই তো সেই শামুকখোল পাখিগুলো। ওই যে বকের মতো দেখতে। দাদু বাসের ছাদে উঠে বসলে ওরা ঘাড় তুলে দাদুর চলে যাওয়াটা দেখতো।

ঝিমিয়ে পড়া তিন্নির হঠাৎ চনমনে হয়ে ওঠা দেখে অবাক হয়ে গেল বন্যা। আর অবাক হলো তিন্নি নিজে। দাদুর ডায়েরিটা ঝিলিক নিয়ে গেছিলো বটে কিন্তু এত মন দিয়ে পড়েছে, এত আপন করেছে তা ভাবতে পারেনি।

ঝিলিকের আচরণে বরাবরই অবাক হয় তিন্নি। সেই ছোট থেকে দেখে আসছে। বয়সে ওর থেকে মাস চারেকের ছোট হলেও আচরণে ওর বড় দিদির বাড়া। কে বলেছে কেবল রক্তের সম্পর্ক থাকলে আত্মীয় হওয়া যায়? আত্মার সম্পর্কটাই আসল। তিন্নি বোঝে ঝিলিক কেনো এসেছে। তিন্নির যদি কোনো বিপদ হয় ও যেন ঢাল হতে পারে।

-আচ্ছা বন্যা তুমি কি রোজ যাতয়াত করো? (প্রশ্ন করলো ঝিলিক)

- ইউনিভার্সিটি থেকে?

-হ্যাঁ গো।

-না না। আসা যাওয়া করাই যায় কিন্তু তাতে পড়ার সময় খুব একটা তো পাবো না।

-আঙ্কেল... আমাদের জন্য আজ আপনার গোটা দিনটাই নষ্ট হলো। (এই প্রশ্নটা ঝিলিক ছুঁড়ে দিল বন্যার আব্বুর দিকে)

-আরে কী যে বলো। তোমরা আমার মেয়ের মতো। মতো কেনো বলছি। মেয়েই তোমরা আমার। তোমাদের জন্য আমরা আব্বুরা সব সময় তৈরি। তাছাড়া গতকাল তোমার আব্বুর সঙ্গে কথা হলো। যা বুঝলাম তোমাদের অসুবিধা হওয়া মানে কেবল ইন্ডিয়ায় নয় বিশ্বের দরবারে আমাদের দেশের মুখ পুড়বে।

ঝিলিক একটু লজ্জায় পড়ে গেল। আসলে ও কারো বাড়ি যাওয়ার আগে তাদের সঙ্গে একটু কথা বলে পরিবেশটাকে সাবলীল করতে চাইছিলো।

তিন্নি আবার হাঁ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্ধকার হয়ে গেছে। গাড়ি বড়ো রাস্তা ছেড়ে ডান দিকে ঘুরতেই তিন্নি দু হাত জড়ো করে প্রণাম করলো। বন্যা জিজ্ঞেস করলো, "কী হলো"। তিন্নি কিছু বলার আগেই ঝিলিক বলে উঠলো "শেতলা তলা। মন্দিরটা আছে?" বন্যার আব্বু বললো, "সংস্কারের অভাবে ভাঙতে বসেছে। কাল সকালে নিয়ে আসবো। তোমরা এত ডিটেইলস কীভাবে জানলে"

-প্রতিটা বাঁক, প্রতিটা গাছ সব বড্ড চেনা লাগছে। এতগুলো বছরে কিছুই তো বদলায়নি। আজ থেকে ৫২ বছর আগে যা ছিলো তাইই তো আছে।

তিন্নির কথা শুনে সুবহান মানে বন্যার আব্বু বলে উঠলো, বিদ্যুৎ আসা, মোবাইলের টাওয়ার বসা আর কয়েকটা টুকটাক বদল ছাড়া তোমার দাদু যেখানে রেখে গেছিলো নলশোধা সেখানেই আছে। কেবল নলশোধা নয় সব গ্রামই এক আছে।

-কেবল গ্রামগুলোর বহু মানুষ নিখোঁজ। যাদের নিরুদ্দেশ সম্পর্কে কোনো ঘোষণা হয় না।

-তিন্নি কী সব বকছিস। (ধমকে উঠলো ঝিলিক)

-ভুল তো কিছু বলিসনি রে মা। বাংলাদেশের যা অবস্থা আমরাও কদিন পর হয়তো নিখোঁজ হয়ে যাবো। (সুবহান বললো)

বন্যাও আর চুপ থাকতে পারলো না। – গ্রামের পরিবর্তন হয়নি কে বললো গো। পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ, দুদিন ছাড়া ওয়াজ..... এই তো দুসপ্তাহ হলো রফিকদাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই জানি খালের পাড়ের বডিটা রফিকদারই কিন্তু কেউ কি কিছু করতে পারছি? রফিকদা কি হিন্দু ছিলো।

-উনি কী করেছিলেন? (প্রশ্ন করলো ঝিলিক)

- রফিকদার অপরাধ প্রতিবছর দুর্গাপুজোর সময় বাংলাদেশে যে হিংসা বেড়ে যাচ্ছে তার উপর একটা প্রতিবেদন করেছিলো এবং সেটা ফেসবুকে দিয়েছিলো। তাতে নাকি সংখ্যাগুরুর অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে।

কথা বলতে বলতে ওদের গাড়ি একটা দিঘির কাছে অপেক্ষারত একজনের সামনে এসে দাঁড়ালো। জানালার কাঁচ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সুবহান বললো,

-চাচা, বড্ড দেরি হয়ে গেলো গো

- এই তো এলাম। মেহমান নাকি?

- হ্যাঁ চাচা, মেয়েটার দোস্ত।

চাচার হাত থেকে থলেটা নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বললো, "আজ রাতে আমাদের দিঘির তাজা মাছ তোমাদের খাওয়াবো"।

"দিঘির ধার ধরে এমন পাকা রাস্তা হয়ে গেছে"? অনেকটা অবাক হয়েই প্রশ্ন করলো তিন্নি

-মা রে একটা কথা বলি। মনে যেন নিস না। তোরা যে গোবিন্দ মামুর কেউ হস, এখানে কেনো এসেছি তা কারো কাছে বলার দরকার নেই। তোরা বন্যার বন্ধু তাই ঘুরতে এসেছিস।

-আচ্ছা। বুঝতে পারছি

একটা বড়ো দরজার সামনে দাঁড়ালো গাড়িটা।

১০

গোবিন্দ শেফালি বিনা বাধাতেই বর্ডার পার করলো। কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে যখন পদ্মা পাড় করছিলো শেফালি তার স্তব্ধতা ভেঙে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। পদ্মার জল আর শেফালির চোখের জল চাঁদের আলোয় একই ভাবে চিক চিক করে উঠলো। নতুন সূর্যের সঙ্গে নতুন দেশ। যাদের বাড়িতে কত কত আশ্রিত আশ্রয় পেয়েছে সেই বাড়ির একমাত্র জীবিত সন্তান নিজের দেশেই পেলো না সামান্য আশ্রয়, সামান্য নিরাপত্তা। যে দেশে যাচ্ছে সেই দেশের মানুষগুলো কখনো কি পারবে গোবিন্দকে আপন করতে? না পারারই কথা। তারা তো অতিথি নয় যে এক তিথি পরে ফিরে যাবে। নিজের ঘরে ভাত না জুটলে অতিথিকেই কেউ পছন্দ করে না তার উপর আবার চিরকালের আশ্রিত। একজন নয় দুজন নয় সংখ্যাটা কয়েক কোটি। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতের আর কোথাও বাংলা চলবে না। ইংরেজি গোবিন্দ লিখতে পারে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গোবিন্দ শুনেছে হিন্দি চলে যার কিছুই সে জানে না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যদি তাকে থাকতে না দেয়! এসব আকাশ কুসুম ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে গেছে। ঘুমিয়ে গেছে শেফালিও। মানুষ যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই তার আনন্দ, তার দুঃখ। ততক্ষণ-ই তার অতীত, তার বর্তমান, তার ভবিষ্যত।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো বর্ডারের একটু দূরে। তখনও আলো ফোটেনি। ড্রাইভার ওদেরকে দাঁড়াতে বলে কাউকে একটা ডাকতে গেল। যখন ফিরলো হাল্কা আলো ফুটেছে। শেফালি পাথরের মতো

দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের মুখেই কোনো কথা নেই। সামনে একটা দেশ পেছনে একটা দেশ। মাঝখানে দুই অনাহূত। গোবিন্দ পকেট থেকে কাগজটা বের করলো। যাতে হার আর কানেরটা মোড়া ছিল। দেখলো বিমল ঘোষাল বলে একজনের নাম লেখা। তাতে বাড়ির ঠিকানাও লেখা নদীয়ার কৃষ্ণনগরের কাছে। ঘন্টা খানেক পরে ড্রাইভার ফিরে এলো সঙ্গে একটি লোক। দেখতে ভারি অদ্ভুত। প্রথম দর্শনেই ভয় লাগে। ঝাঁকড়া উসকোখুসকো চুল, বড়ো বড় চোখ, চোখগুলো লাল, মুখে হাল্কা দাড়ি... লোকটা দেখে শেফালি গোবিন্দর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

-"তো কোথায় ছাড়তে হবে"

- "ন... ন... দিয়া" গোবিন্দ উত্তর করলো।

- পুরো পঞ্চাশ টাকা লাগবে

ড্রাইভারটা লোকটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কিছু একটা বলতে লোকটা ওকে অনুসরণ করতে বললো। গোবিন্দ আর শেফালি রোবটের মতো বিনা প্রশ্নে লোকটার পিছু নিতে লাগলো। এদিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। মিনিট পঁয়তাল্লিশ মতো হাঁটার পর একটা জায়গায় দাঁড়ালো। তারপর লোকটা বললো, "তোমাদের কাছে যা আছে দাও" চমকে উঠলো গোবিন্দ। "আরে ভয়ের কিছু নেই। জাকির আমার দোস্ত আছে"

-জাকির?

-যার সঙ্গে এলে তার নাম জানো না?

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো গোবিন্দ। তারপর পকেট থেকে চেন আর আঙটি বের করে দিল। লোকটা হাতের তালুতে রেখে উপর নীচু করতে করতে বোঝার চেষ্টা করলো ওজন কত হতে পারে। তারপর বললো, "এক ভরি হবে বলে মনে হচ্ছে না"। তখনও ছেলে মেয়েদুটো চুপচাপ। লোকটি বললো, "এখন ভরিতে একশো আশি মত চলছে। দেড়শো রাখো। এখানে যে বাসটায় চাপিয়ে দেবো সেটা যেখানে থামবে সেখান থেকে কৃষ্ণনগরের বাস পেয়ে যাবে। আর দাঁড়াও এখনি আসছি"। বলে লোকটা চলে গেল। কিছু পরে এলো। হাতে দুটো রুটি আর একটা পাত্রে জল নিয়ে হাজির। গোবিন্দর হাতে দিয়ে বললো, "পাঁচ পয়সা দাও"। লোকটার দেওয়া টাকা থেকেই একটা পাঁচ পয়সা বের করে দিলো। লোকটা নিয়ে বললো, "এই তো। বেশ শিখে গেছো। খুচরোগুলো বাইরে রেখে নোটগুলো ভেতরের পকেটে রাখো। আর বৌমা! দেখো যা হবার তা তো হয়েছে। তোমাকেই এখন ভায়ের পাশে দাঁড়াতে হবে"। শেফালি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। লোকটাকে দেখে এতক্ষণ ভয় লাগছিলো। 'বৌমা' ডাকটায় ভালো

লাগলো। লোকটা বললো, "চলো, বাস স্ট্যান্ড যেতে আরও কিছুটা হাঁটতে হবে"। হাঁটতে হাঁটতে লোকটা বলতে লাগলো, "তোমরা জাকিরের খাস লোক বলে তো অনেক ভালো। ও দেশ থেকে পিলে পিলে যা আসছে সবাইকে তো ওই শিবিরে পাঠাচ্ছি। মাথা পিছু দশ টাকা। টাকা না থাকে তো যা আছে তাই দাও। জিন্না টাকা জাকির ভাঙিয়ে দেয়"। গোবিন্দ কিছুটা চমকে উঠে প্রশ্ন করলো, "জাকির ভাই কী করেন"?

-আগে তো তোমাদের মাস্টারের গাড়ি চালাতো। এখন বর্ডার পার করায়। এটায় ভালো কমিশন আছে। তাছাড়া মানুষের উপকার-ও হচ্ছে। তোমরাই বা ওদেশে থেকে কি করবে ওই খুনোখুনির মধ্যে থেকে"। গোবিন্দর খুব ইচ্ছা করছিলো লোকটার নাম জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু পারলো না। লাখ লাখ কোটি কোটি হিন্দুর ক্রাইসিসকে কাজে লাগিয়ে কত মানুষ তার করে খাবার রাস্তা বানাচ্ছে। কাদের শেখদের দখলে গোবিন্দদের বাড়ি জমি। শেষ সম্বলটুকুও ছিনিয়ে নিচ্ছে জাকিরের দলবল তাও আবার উপকারের নামে। এসব ভাবতে ভাবতে জঙ্গলের ভতর দিয়ে লোকটাকে অনুসরণ করে হেঁটে চললো।

"তোমরা কিন্তু ইন্ডিয়ায় ঢুকে গেছো"। লোকটার কথাতে টনক নড়লো। অবাক দৃষ্টিতে চারপাশ তাকিয়ে দেখলো গোবিন্দ আর শেফালি। ওদের দেশের মতোই তো। তবে নতুন দেশ কেনো বলছে। আরও খানিকটা এগোতেই পাকা রাস্তা। লোকটা বললো, "এখানেই দাঁড়াও। গেদে যাওয়ার বাস আসবে তাতে চেপে পড়বে। মিনিট কুড়ি লাগবে। সেখান থেকে কৃষ্ণনগরের বাস পেয়ে যাবে। দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যাবে"।

১১

তিন্নি, ঝিলিককে একটা ঘর খুলে দিলো বন্যা। বাড়িটা পুরনো আমলের। কিন্তু নতুন করে সাজানো যে হয়েছে তার ছাপ স্পষ্ট। তিন্নির খুব ইচ্ছা করছিল বাড়িটা ঘুরে দেখতে কিন্তু বলতে পারলো না। বন্যা বললো, "ঐ যে বাথরুম। নাও ফ্রেশ হয়ে নাও" সেসময়ই বন্যার মা সাবিনা ঘরে ঢুকলো হাতে সরবতের গ্লাস নিয়ে। "পানিটা আগে খেয়ে নাও। সেই কখন বেরিয়েছো। শুকিয়ে গেছো একেবারে। বনি, তুইও যা ফ্রেশ হয়ে নে আমি নাস্তা রেডি করে ফেলেছি"। তিন্নি ব্যাগ থেকে তোয়ালে আর জামা বের করে বাথরুমে চলে গেলো। ঝিলিক সরবতের গ্লাস নিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলো। আনমনা হয়ে চারিদিক তাকিয়ে ঢাকায় নামা মাত্রই দুটো সিমকার্ড দুজনকে দিয়েছিলো বন্যার বাবা। বলেছিলো, "রিচার্জ করা আছে। ফোনে লাগিয়ে নাও"। মানুষগুলোকে তো দেখে বড্ড ভালো মানুষ মনে হচ্ছে। আবার কেমন যেন সন্দেহ-ও হচ্ছে। আজ যে নলশোধার বাড়িতে ওরা আপ্যায়ন পাচ্ছে খুব বেশি তো হয়নি মাত্র

পঞ্চাশ বছর আগে এই বাড়িতে রক্ত গঙ্গা বয়ে গেছে। যার পূর্বমানুষদের হত্যা করা হয়েছে তাদেরই উত্তরমানুষ এসেছে, হত্যাকারীর উত্তরমানুষ আপ্যায়ন করছে। বড়ো অদ্ভুত লাগছে ঝিলিকে।

তবে হিসেব মতো এবাড়ির সঙ্গে তিন্নির রক্তের যোগ নেই। তিন্নির মা শেফালির সন্তান হলেও গোবিন্দর বা কাদের শেখের নয়। শেফালি কখনো শয়তানটার নাম বলেনি। গোবিন্দ কেবল জানতো কাদের শেখের লোকজন। কিন্তু কখনো প্রশ্ন করেনি। কৃষ্ণ কি যশোদার সন্তান নয়? ছায়াও তেমনি গোবিন্দরই সন্তান।

-যা স্নান করে আয়।

-তোর হয়ে গেল?

-হ্যাঁ রে।

ঝিলিক জামা কাপড় নিয়ে চলে গেল। তিন্নি ঘরটার চারপাশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ওর খালি মনে হতে লাগলো এটা বড় দাদুর ঘর। মানে গোবিন্দর দাদার ঘর। তবে বাথরুমটা নতুন সংযোজন হয়েছে। এমন সময় বন্যা এলো।

-"কাল ঢাকা যাবে"?

- না কেনো? এই তো ঢাকা থেকে এলাম।

- চলোনা কেনাকাটা করার ছিলো কিছু। আর আমার একটা ক্লাস-ও আছে।

- আসলে গ্রামটা ঘোরার ইচ্ছা ছিলো...

- আচ্ছা বেশ। তাহলে কাল তো আমকে যেতেই হবে। তোমরা বরং আম্মুর সঙ্গে যেও।

ঝিলিক বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। -কোথায় যাবি রে?

-আরে এমনিই এই গ্রামটা ঘুরব তাই বলছিলাম।

- আচ্ছা চলো চলো। আম্মু বললো আর নাস্তা করে কাজ নেই। রাত হয়েছে। একেবারে রাতের খাবার খেয়ে নেবে চলো।

বন্যার সঙ্গে তিন্নি আর ঝিলিক খাবার ঘরে গেলো।

সবকিছু ঝিলিকের বড্ড চেনা। ওই তো দালানে সেই চেয়ারটা যেটায় গা এলিয়ে শুয়ে থাকতো তিন্নির দাদুর বাবা। তিন্নি তাকিয়ে রইলো খানিক।

"আম্মু দাদি খেয়েছে"?

"হ্যাঁ। আমি খাইয়ে এসেছি"।

"দাদি মানে"? প্রশ্ন করে উঠলো তিন্নি।

"দাদি মানে দাদি। আব্বুর মা"। উত্তর দিলো বন্যা।

"দাদির কথা আগে তো বলোনি"

"হ্যাঁ। দাদি খুব অসুস্থ। কথাও বলতে পারে না। কাল দাদির সঙ্গে দেখা করাবো"।

সাবিনা কত কিছু রান্না করেছে তা গুণে শেষ করা যাবে না। কিন্তু তিন্নি ঠিকমতো খেতে পারলো না। বারবার মনে হতে লাগলো দাদির কথা কেনো বলেনি। মনের মধ্যে খচখচানি নিয়ে শুতে গেলো ঠিকই কিন্তু সারাদিনের ধকলে ঘুম এলো অনায়াসেই।

১২

বাস এসে কৃষ্ণনগর পৌঁছালো। গোবিন্দ নেমে একটা দোকানে জিজ্ঞেস করলো হলধর মুখার্জীর বাড়ির রাস্তা। একজন দেখিয়ে দিতে ওরা সেই মতো হাজির হলো। পেল্লাই একটা বাড়ি। একদম নতুন বলে মনে হচ্ছে। চারদিক ঘেরা, মাঝে মোটা গ্রিলের দরজা, পাথর বিছানো পথ পেরিয়ে বাড়িটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটার সামনে অপ্রস্তুতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো শেফালি আর গোবিন্দ। এতক্ষণে শেফালি মুখ খুললো, "তোমাদের বাড়িটা এরচেয়ে বড়ো"।

-সে এক কোনো জন্মে ছিলো।

-সব ঝামেলা মিটলে ফিরে যাওয়া যাবে না?

-যাবে হয়ত...

আবার স্তব্ধতায় কেটে গেল বেশ কিছুটা সময়। ওদের পেছনে কখন একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো ওরা বুঝতেই পারে নি।

"অ্যাই তোমরা কারা?" পেছন থেকে বাজখাঁই গলায় বলে উঠলো কেউ।

“আমরা মানে... হলধর বাবুর কাছে এসেছি” ইতস্তত করে গোবিন্দ বললো।

লোকটি আপাদমস্তক দেখে বললো, “বলো। আমিই হলধর মুর্খাজি”

গোবিন্দ প্রণাম করলো, শেফালিকেও করতে বলে বললো, “নাসের স্যার... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের.....”

-আরে তোমরা নাসেরের পরিচিত?

- হ্যাঁ স্যার।

-আচ্ছা ভেতরে চলো।

হলধর বাবু সব কথা শুনে একপ্রকার চোয়াল শক্ত করে বসলেন। বললেন, “সবার প্রতি কর্তব্য করার সাধ্য আমার নেই। তবু যদি একজনের জন্যেও কিছু করতে পারি তাহলে জানবো এজন্মে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করেছি। বাড়ির পেছনে একটা ঘর আছে, ড্রাইভারের জন্য করা। কিন্তু তাতে কেউ থাকে না। তোমরা আপাতত থাকো তারপর দেখি কী করা যায়। আপাতত যা লাগবে সবই আছে খালি জামা কাপড় তোমাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে হবে”

গোবিন্দর যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। নতুন দেশে এসে এত সহজে মাথা গোঁজার জায়গা পেয়ে যাবে ভেবে নাসের স্যারকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিলো এমন সময় হলধর বাবু বললেন, “নাসেরকে চিঠি লিখে যদি তোমাদের জায়গা জমিগুলো বেচে কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। তবে করবে বলে মনে হয় না। ইচ্ছা থাকলে আমার গলায় না ঝুলিয়ে নিয়েই পারতো কিছুদিন তোমাদের আশ্রয় দিতে”। তারপর শেফালির দিকে তাকিয়ে বললো, “তা মা রান্নাবান্না কিছু পারো”?

শেফালি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

“দেখো আমার গিন্নি তো গত হয়েছেন ওদিকে ছেলে থাকে কলকাতায়। তুমি যদি হেঁসেলটা সামলাতে.....”

শেফালি রাজি হয়ে গেল।

“আর গোবিন্দ, আমার বেশ কয়েকটা দোকান আছে তার মধ্যে মুদিখানাটায় একটা বিশ্বস্ত লোক খুব প্রয়োজন যে হিসেব টিসেবগুলো করে দিতে পারবে...”

এই করে গোবিন্দ শেফালির একটা হিল্লে হয়ে গেল। কিন্তু সুখ বেশিদিন ওদের সহ্য হলো না। মাস দুয়েকের মধ্যে শেফালি নিশ্চিত হয়ে গেলো তার গর্ভে বেড়ে উঠছে সন্তান। শেফালি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছিল কিন্তু পুনরায় মেয়েটা আবার ঝিমিয়ে গেলো। সে এই পাপের সন্তান চায় না। কিন্তু উপায়-ও নেই। গোবিন্দর না আছে অর্থ বল না লোক বল। সে পড়লো মহা সমস্যায়। শেফালি কিছুতেই নিজের যত্ন নেয় না। বারবার একই কথা বলতে থাকে "পাপের রক্ত, পাপের রক্ত..." শেষের দিকটায় যখন ছায়ার জন্মের সময় এলো, শেফালি পুরোপুরি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছিলো। গোবিন্দ পড়েছিল মহা সমস্যায়। তবে হলধরবাবু যথাসম্ভব একমাত্র অভিভাবকের মতো পাশে দাঁড়িয়েছিলো। ছায়ার জন্মের দিনই শেফালি দেহ রাখলো। হলধরবাবু ছায়াকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলো। লোকে তো ছায়াকে গোবিন্দ-র নয় হলধরবাবুর মেয়ে বলেই জানতো।

১৩

পঞ্চমীর সকালে ঘুম থেকে উঠতে তিন্নিদের একটু দেরী হয়ে গেলো। বন্যা বেরিয়ে গেছে তার ক্লাসের জন্য। বন্যার বাবাও চলে গেছে চেম্বারে। সাবিনা রেডি হচ্ছে স্কুলের জন্য।

"এই যে তোমরা উঠে গেছো? বাইরে দুয়ারে যাও বনির দাদি আছে। আমি চা নিয়ে যাচ্ছি"।

"বনির দাদি" বলতেই চমকে উঠলো তিন্নি। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলো একটা বয়স্ক মহিলা দাদুর বাবার চেয়ারটায় গা এলিয়ে শুয়ে আছে। সারাবাড়ি অন্যের দখলে চলে গেছে তিন্নির তাতে রাগ হয়নি চেয়ারটায় একজন আরাম করে বসে আছে এ দৃশ্য যেন তিন্নি সহ্য করতে পারলো না। তিন্নি বন্যার দাদির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বুড়ি এমনভাবে চমকে উঠলো যেনো সে ভূত দেখেছে। কিছু একটা বলার চেষ্টা করতে লাগলো, পারলো না। চোখগুলো যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইলো। ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলো তিন্নি। সাবিনা চা হাতে এসে শাশুড়ির আচরণটাকে অদ্ভুত রকমের স্বাভাবিকভাবে নিলো। বললো,

"আম্মু, বনির বন্ধু এরা। ইন্ডিয়া থেকে এসেছে"। বুড়ির গোঁয়ানি আরও বেড়ে গেলো। তিন্নি ভয় পেয়ে চায়ের কাপটা নিয়ে ঘরে চলে গেলো। ঝিলিক খানিক বুড়ির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে কিছু বোঝার চেষ্টা করলো। তিন্নি ঘরে চলে যেতেই বুড়ির গোঁয়ানি আরও বেড়ে গেলো। ঝিলিক-ও ঘরে ফিরে গেলো।

সাবিনা ঘরে এসে বললো, "কিছু মনে কোরো না। নতুন মানুষ দেখে অমন করছেন। আম্মুর গল্প পরে তোমাদের কাছে করবো। গ্রাম দেখতে যাবে বলছিলে তো রেডি হয়ে নাও আমার স্কুলে একটা কাজ আছে, রণিকে বলে রেখেছি ও ঘুরিয়ে দেবে তোমাদের"।

-"রণি"? প্রশ্ন করলো তিন্নি।

-তোমাদের চাচুর চেম্বারে কাজ করে। খুব ভালো ছেলে।

গ্রাম কি ঘুরবে তিন্নি। সব যেন ওর চেনা। চেনা চেনা লাগছে ঝিলিকের-ও। দাদুর ডায়েরি আর তিন্নির মুখে দাদুর গল্প অচিরেই তার মনেও একটা ছবি তৈরি হয়েছিল। দিঘির ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা স্নিগ্ধ হাওয়া ওদের আলিঙ্গন করে ছুটে বেড়াতে লাগলো। তিন্নি ঝিলিককে বললো, "ছোট দিদা মনে হয় শেষ এখানেই দাঁড়িয়েছিলো"।

ঝিলিক দিঘির পড়ে ফাঁকা মাঠ চিরে যে আলের মতো রাস্তাটা চলে গেছে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলো। তিন্নিকে বললো, "রাস্তাটা দেখেছিস" তিন্নিও যেন ধানক্ষেতের মাঝে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেল। পঞ্চাশ বছর আগের এমনি এক আশ্বিনের ঘটনা চোখের সামনে দেখতে পেল।

রণি বললো স্কুলে চলো। তোমরা গেলে তবে তোমাদের নিয়ে চাচি ফিরবে বাড়ি। আজ থেকে তো ছুটিও পড়ে যবে।

"এই গ্রামে পুজো হয়?" প্রশ্ন করলো ঝিলিক

"ওই মাঠের পরে যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে ওখানে হয়"।

ঝিলিক তিন্নি একে অন্যের মুখের দিকে তাকালো। ওটাই সেই গ্রাম যেখান থেকে তিন্নির দাদু ফিরতে ফিরতে ফেরার হয়েছিল।

কিছু না বলে হাঁটা শুরু করলো। গ্রামের লোক অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখছিলো ওদের। রণি সবাইকে বলতে বলতে গেলো, "বনির বন্ধু। ছুটিতে গ্রাম ঘুরতে এসেছে"।

ওরা গিয়ে দাঁড়ালো মহামায়া স্কুলের সামনে। সামনে দাদুর বাবার মায়ের মূর্তি। দেখেই বুঝলো তিন্নিরা। দাদুর মুখে স্কুলটার গল্প শুনেছিল। বেশ ভালো লাগলো ওদের। ওরা যেতেই হাসি মুখে বেরিয়ে এলো সাবিনা। তারপর বাড়ি।

বাড়ি ফিরে তিন্নির যেটা মনে হলো সেটা হলো বাড়িটাই তো ভালো করে ঘোরা হয়নি। সাবিনাকে বললো, "কাকিমা, আমরা কি একটু ঘরগুলো ঘুরে দেখতে পারি? আর ছাদে যেতে পারি?"

-আচ্ছা, আগে নাস্তা করে নে। তারপর আমি ঘুরে দেখাবো। ঠিকাছে?

তিন্নির সন্দেহ হলো। তবে কি এবাড়িতে ওর একা ঘোরা নিষিদ্ধ বোঝাতে চাইলো। কিছু না বলে ওরা খেয়ে নিলো। সাবিনা দেখাতে শুরু করলো। নিচে তিনটে ঘর আর রান্না ঘর। বাইরে থেকে এলে প্রথম যে ঘরটা পড়ে তাতে সুবহান চেম্বার করে সন্ধ্যায়। তার পাশের একটা ঘর গরমকালে দিনের বেলায় ওটায় থাকে বন্যারা। তারপর রান্নাঘর তারপর সিঁড়ি। সিঁড়ির অন্যপাশে বাথরুম। তার পাশের ঘরটায় থাকে বন্যার দাদি। ঘর লাগোয়া টানা দুয়ারের একপাশে অতিথিদের বসার ব্যবস্থা অন্য পাশে খাবার টেবিল। উপরেও তিনটে ঘর আর টানা লম্বা দুয়ার। তিনটে ঘরের একটাতে বন্যার মা বাবা, অন্যটায় বন্যা আর বন্যার দাদির ঘরের উপরেরটা অতিথিদের জন্য যেটায় এখন তিন্নিরা আছে। তিন্নি একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললো "দাদির ঘরটায় দাদুর মা বাবা থাকতো"। সাবিনা শুনতে পেল ঠিকই কিন্তু শুনতে না পাওয়ার ভান করে বললো, তোমরা ছাদে যাও আমি দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করি"।

"বাঁচা গেল" ঝিলিক বলে উঠলো।

"আচ্ছা ঝিলিক চিলেকোঠায় ঠাকুর ঘর ছিলো। সেটাকে কী করেছে চল দেখি"

ছাদে উঠতেই ঘরটা চোখে পড়লো। কিন্তু তালা দেওয়া কোনোভাবেই ঘরটাকে দেখার উপায় নেই। ছাদে গিয়ে উত্তর দিক ঘেঁষে তিন্নি আর ঝিলিক বসলো।

"জানিস ঝিলিক, এখানটায় এমন দুপুর বেলাতেই দিদা আর কাজু দিদা বসে গল্প করতো"।

-আচ্ছা শেফালি দিদার বাড়িটা খুঁজে পাওয়া যাবেনা না?

-আরে এ... এটা কেনো মাথায় আসেনি। যাবে তো।

বলেই তিন্নি দৌড়ে গেল ছাদের দক্ষিণ পূব কোণের দিকে। অনুসরণ করলো ঝিলিক। "দাদু তো বলেছিল এখান থেকেই কাজু দিদা শিউলি বলে ডাক দিত আর দিদা ঘর থেকে দৌড়ে ছাতিম গাছের তলায় এসে চিৎকার করে বলতো যাই"।

-কিন্তু এদিকে কোনো ছাতিম গাছ তো দেখছি না।

- পঞ্চাশ বছর আগের কথা। আর কি মেলে?

“কি মিলছে না রে তোদের?” পেছন থেকে বলে উঠলো বন্যার বাবা।

তিন্নি উত্তর করলো, “ছাতিম তলা। এদিকে একটা ছাতিম তলা ছিলো”

-বাপরে তুই তো দেখছি সব জানিস।

-বছর দশেক হলো গাছটা কাটা হয়েছে।

-তার সামনে যে বাড়িটা ছিলো?

-সে বাড়ির কথা কি জানিস?

- পিসি দিদার সই-এর বাড়ি।

- সেসব তো আমার জন্মের আগের কথা। তবে যা শুনেছি দাঙ্গার দিন ওই বাড়ির মেয়েটাকে খুঁজে না পেয়ে বাড়িটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

-আচ্ছা কাকু সত্যিই বলোতো দাঙ্গা বলা যায় কি? দাঙ্গা তো দুপক্ষের লড়াইকে বলে। অন্যপক্ষ কি লড়াইয়ের সুযোগ পেয়েছিলো?

-বাদ দে না মা।

- জানো কাকু, যে মেয়েটাকে পাওয়া যায়নি সে-ই আমার দিদা।

-মানে তুই শিউলি মাসির নাতনি?

-হ্যাঁ।

- শিউলি মাসি আর গোবিন্দ মামা বিয়ে করেছিলো? ওদের দেখা হলো কীভাবে?

সবটা বললো তিন্নি। সাবিনা ডাকতে এসে তিন্নির কথা শুনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেল।

তারপর বললো। তখন হিন্দু তাড়িয়েছে, এখন তসলিমাদের তাড়াচ্ছে, ব্লগার মারছে। আমাকেও তো সেদিন শাসিয়ে গেল বনি না পর্দা করলে ওর বিপদ আছে। উঠতে বসতে পোড়া গ্রামে ডাক্তারের নেহাত দরকার তাই বেশি কিছু বলে না।

ঝিলিক জিজ্ঞেস করলো, তোমরা ঢাকায় চলে যাওনা কেনো?

-আম্মুর জন্য। আম্মু যতদিন আছে ততদিন এখানেই থাকব।

-বন্যা কখন আসবে?

-ওর বিকেল হবে। চল খেয়ে নিবি।

-"হ্যাঁ যাই। কাকু যাবে ছাতিম তলাটা যেখানে ছিলো সেখানে নিয়ে"? তিন্নি জিজ্ঞেস করলো।

-আচ্ছা কাল বনির সঙ্গে যাস।

বিকালে বন্যা ফিরলো। সঙ্গে ইয়া বড়ো বড়ো ব্যাগ।

"বললাম সঙ্গে চলো। গেলে না তো। এবার আমার পছন্দের জিনিসই পরবে পুজোয়"

"মানে টা কি"? ঝিলিক, তিন্নি দুজনেই অবাক

"পুজোয় বাড়িতে কেউ এলে তোমারা তো নতুন জামা দাও"

"তাবলে এত নাকি"?

"চারদিনের চারটে তো"।

তিন্নি, ঝিলিক দুজনেই হেসে ফেললো।

পঞ্চমীর রাত থেকে বন্যার দাদির শরীর খুব খারাপ হলো জ্বর। ষষ্ঠীর গোটা দিনটা দাদিকে নিয়েই ব্যস্ততায় কাটলো। সপ্তমীর সকালে অবস্থা খানিক ঠিক হলো। সাবিনা, বন্যা, তিন্নি, ঝিলিক গেলো ঠাকুর দেখতে মাঠের ওপারের গ্রামে। রণি নিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বন্যা বলেছিলো স্কুটিতে ওরা তিনজনে মাঠের রাস্তা দিয়ে চলে যাবে। সাবিনা রাজি হয়নি। তাই ঘুর পথে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে।

১৪

মায়ের ঘরে ঢুকলো সুবহান।

"আম্মু আজ শরীর কেমন লাগছে"?

মায়ের চোখের ভাষা ছেলে কী বুঝলো তা কেবল ছেলেই জানে।

পাশে বসে মায়ের হাতটা আলতো করে ধরে বললোও। "আম্মু জানো গোবিন্দ মামা ভারতে চলে গিয়েছিলো। আর শেফালি মাসিও। যে মেয়ে দুটো এসেছে তার মধ্যে একজন ওদের নাতিন। আমি জানি তুমি চিনতে পেরেছো। তাই দেখা মাত্র তুমি অমন করছিলে। তোমার

আলমারীতে তোমার আর শিউলি মাসির যে ছবি আছে আমি দেখেছি। পরশু আনতে গিয়ে এয়ারপোর্টে যখন দেখলাম আমিও চমকে উঠেছিলাম তোমারই মতো"।

কাজরি একটা বাচ্চা শিশুর মতো হাঁ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে। যেনো বাবা তার ছোট মেয়েকে গল্প বলছে। হিসেব মত কাজরির বয়স বেশি নয় ৬৭ বছর হবে খুব জোর। কিন্তু রোগে ভুগে সে আরও বয়স্ক হয়ে গেছে।

"আম্মু ও কেবল তোমার খোঁজেই এসেছে। গোবিন্দ মামার শেষ ইচ্ছাপূরণ করতে এসেছে।

কাজরি অনেক কষ্ট করে বলে উঠলো, "শি শি শি....." এর বেশি পারলো না।

-হ্যাঁ শিউলি মাসি সেদিন গোবিন্দ মামার সঙ্গে পালাতে পেরেছিলো।

সুবহান ওর মাকে সব বললো যা জেনেছে তিন্নির থেকে। ওরা ফিরলে দেখা করবে? সাপের মতো ফুঁসে উঠলো। মায়ের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে কিছু বলার সাহস পেলো না সুবহান। বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

১৫

ঠাকুর তলায় সবে পৌঁছেছে ওরা হঠাৎ ভয়ঙ্কর চিৎকারে কেঁপে উঠলো চারিদিক। যে যেদিকে পারলো ছুটলো। দুমদাম ঘরের দরজা বন্ধ হবার শব্দ। সাবিনা কিছু বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে গাড়ি ছাড়তে বললো। ফেরার রাস্তার দিকে কিছুটা এগোতেই দেখলো কিছু লোক আগুন অস্ত্র নিয়ে দৌড়ে আসছে। সামনে জন্তুর দল পেছনে হায়নার দল। বাঁদিকের একটা পথ দেখে কোনো মতে গাড়িটা চালিয়ে দিলো রণি। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না কিছুদূর গিয়ে রাস্তাটা একটা মাঠের মাঝখানে শেষ হয়েছে।

সাবিনা বললো, ওরা এদিকেও আসবে। গাড়ি রেখে কোথাও একটা লুকাতে হবে। খানিক দূরে সামনে মাঠ, ডানদিকে বিরাট দিঘি, বাঁদিকে একটা বাড়ি সঙ্গে গোয়াল চালা ওরা গিয়ে গোয়ালে আশ্রয় নিলো। ওখান থেকে দেখলো মানুষের মত দেখতে উন্মত্ত জনতা ওদের গাড়িটায় আগুন ধরিয়ে দিলো। সাবিনা কেঁদে উঠলো। তিন্নি, ঝিলিকের হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে, বন্যা, রনির অবস্থাও তাই। লোকগুলো ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। কিন্তু গোয়ালে না ঢুকে বাড়িটায় ঢুকলো কাউকে না পেয়ে ভাঙচুর করে ওদিক থেকে চলে গেলো। আশ্চর্যজনকভাবে মোবাইলে কোনো নেটওয়ার্ক নেই।

সাবিনা বললো, তারমানে পুরোটা প্ল্যান করেই এসেছিল। এরা কাউকে বাঁচতে দেবে না। এখন এখানে থাকাই ভালো। পুলিশ আসুক তারপর মাঠের রাস্তা ধরে ফিরবো।

তিন্নি যেন ৭০সালে ঘটে যাওয়া নলশোধা গ্রামের ঘটনাকে চোখের সামনে দেখতে পেলো। সুমন স্যার সেমিনারে বলেছেন, "পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হয়ে পুনরায় পাকিস্তানে যাওয়ার রাস্তা প্রস্তুত হয়েছে"।

পুলিশ এলো তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওরা বেরিয়ে এলো। মণ্ডপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সকালে এসে যে মূর্তির সামনে দাঁড়িয়েছিলো তা তছনছ করে দিয়েছে জানোয়ারের দল। প্রতিটা মানুষের চোখে মুখে আতঙ্ক। সাবিনা পুলিশকে তার পরিচয় দিতে পুলিশ পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলো ওদের। রাত তখন দশটা বাজে ওরা বাড়িতে ঢুকলো।

১৬

সারাটা দিন সুবহানের কীভাবে কেটেছে তা কেবল ওরাই জানে। ওদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে প্রায় পাগল পাগল অবস্থা। টিভিতে খবরে দেখছে বাংলাদেশের নানা মণ্ডপে আক্রমণের খবর। নাটোরের একটা পূজামণ্ডপে গান বাজানো নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত। সেকেন্ডের মধ্যে গোটা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। নিরাপত্তার খাতিরে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে প্রশাসন।

অন্যদিকে সুবহানের মা। যার মুখ দিয়ে আজ পর্যন্ত কোন কথা শোনেনি সুবহান। দুপুর থেকে তার শুরু হয়েছে অদ্ভুত গোঁয়ানি আর "মর মর" করে চিৎকার। সন্ধ্যায় অবস্থা এমন তীব্র হয় যে সুবহান বাধ্য হয় ঘুমের ইঞ্জেকশন দিতে।

ইতিমধ্যে ঝিলিকের বাবা দুবার ফোন করেছে... ওরা ফিরতে যেন ধরে প্রাণ ফিরে পেল সুবহান। ঝিলিকের বাড়িতে, তিন্নির বাড়িতে ফোন করে স্বস্তির শ্বাস নিলো।

সাবিনা আর বন্যা বলতে লাগলো পুরো ঘটনা। ঝিলিক, তিন্নির মুখে কথা নেই। ওরা ওদের ঘরে চলে গেল। কিছু বন্যা খাওয়ার জন্য ডাকতে গেলে ওরা জানায় কিছু খাবেনা।

-বাবাকে বলবো কালকেই ফেরার ব্যবস্থা করতে?

-কালকে বেরোনো কি ঠিক হবে? তাছাড়া এদের গাড়িটাও তো...

-তা ঠিক কালকের মধ্যে সব হবে না। তাহলে পরশু।

- আচ্ছা। কালকের দিনটা যাক। কাকু তো বলছিলো সারা বাংলাদেশের নানা জায়গায় হচ্ছে।

তবু ঝিলিকের মন মানলো না। বাবাকে মেসেজ করলো। ওর বাবা উত্তর করলো, "পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। এখন বেরোনো ঠিক হবে না। ওখানেই থাক কিছুদিন। আর কোথাও ঘুরতে যাওয়ার দরকার নেই।"

১৭

অষ্টমীর সকাল হতেই বন্যা দরজা ধাক্কা দিতে শুরু করলো। ঝিলিক দরজা খুললো। "তোমরা একটু নীচে যাবে গো। দাদি খুব উতলা হয়ে পড়েছে দেখা করার জন্য"।

ঝিলিক, তিন্নি চোখে মুখে জল দিয়ে নেমে গেলো। তিন্নিকে ধরে সুবহান মায়ের পাশে বসালো। কাজরি তিন্নির মুখটা দুহাতে ধরে কী যেন দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বন্যা বললো, "দাদি তোমার শিউলি এখন আমার বন্ধু"। চমকে উঠলো তিন্নি আর ঝিলিক। কাজরি বন্যাকে হাত নেড়ে পাশে বসতে বললো। তেইশ বছরের জীবনে এই প্রথম বন্যাকে কাছে ডাকলো কাজরি। বন্যা দাদির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। স্কুলে পড়া অবধি বন্যা দাদিকে পাথর ছাড়া আর কিছুই ভাবতো না। দুয়ারে ও খেললে দাদি ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিত। সাবিনা খাবার দিয়ে এলে সে দিব্বি খেয়ে নিত। বাড়ির মধ্যে সাবিনাকেই পছন্দ করে কাজরি। এই আচরণগুলো বন্যাকে খুব দুঃখ দিতো।

তখন সে ক্লাস নাইনে পড়ে। সুবহান আর সাবিনা বাড়িতে ছিলো না। বন্যা জল তোলার মটরটা বন্ধ করতে গেলো। কাজরি বসেছিলো দুয়ারেই ওর বাবার চেয়ারে। কোনো এক কারণে সুইচে হাত দেওয়া মাত্রই টেনে ধরলো বন্যাকে। কাজরি মুহূর্তের মধ্যে দৌড়ে গিয়ে বাড়ির মেন সুইচ নামিয়ে দেয়। বন্যা পড়ে যায় এবং জ্ঞান হারায়। কাজরিই তার জ্ঞান ফেরায়। রান্নাঘর থেকে দুধ এনে খাওয়ায়। বন্যা একটু সুস্থ বোধ করলে টেবিলে থাকা বন্যার মোবাইলটা বন্যার হাতে দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। সেদিন বন্যা তার দাদিকে নতুন করে চিনেছিলো। মা-কে প্রশ্ন করেছিলো, "দাদি কেনো এমন"? বন্যাকে বলেছিলো, "ইকবালতো তোমাকে খুব জ্বালায়? তুমি তো বিরক্ত বোধ করো। মনে করো একদিন ইকবাল আমাদের বাড়ি এসে আমাকে আর তোমার আব্বুকে মেরে দিয়ে এই বাড়ি দখল করে নিলো আর তোমাকে বিয়ে করলো গায়ের জোরে তাহলে তুমি কী করবে?"

-এ আবার কেমন কথা? কি ভয়ানক। হয় ইকবালকে মারবো নয়তো মরবো।

-দাদিও তো বেঁচে আছে লাশের মতো।

তারপর নলশোধার ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে বন্যা জেনেছিলো ৭০ সালে ঘটা ঘটনার কথা। তাই যখন তিন্নির কথা জানতে পারলো ও কেবল ওর দাদির কথা ভেবেই বারবার অনুরোধ জানিয়েছিলো বাংলাদেশ আসার জন্য।

১৮

নবমী, দশমী বন্যাদের বাড়ি আনন্দ উৎসবে ভেসে রইলো। তিন্নি তার মায়ের সঙ্গে দেখা করালো কাজরির ভিডিও কলে। ছায়া বারবার বললো পরের বছর অবশ্যই আসবে। কাজরি অদ্ভুত একটা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। যে তাকানোটা ঝিলিকের একদমই ভালো লাগে না। অঘটনটা ঘটলো দশমীর রাত্রে। খেয়ে দেয়ে সবাই যখন শুতে চলে গেছে তারপর। একাদশীর দিন সাবিনা চা দিতে গিয়ে দেখলো শাশুড়ির ঘরের দরজা বন্ধ। অনেক ধাক্কাতেও যখন খোলে না। সুবহানকে ডেকে দরজা ভাঙার ব্যবস্থা করা হলো। দরজা ভাঙতেই চোখে পড়লো কাজরির ঝুলন্ত দেহ। আর বিছানায় একটা চিঠি।

“তোমরা যখন এই চিঠি দেখবে তখন আমি দাদার অনেকটাই কাছে চলে গেছি। অনেক প্রশ্ন বাকি আছে। এতদিন যে অপেক্ষায় বেঁচেছিলাম তা শেষ হয়েছে। আমি রুবিনা বেগম নই। আমি কাজরি। কাজরি বিশ্বাস। তাই আমার এই দেহ পারলে আগুন দেওয়ার ব্যবস্থা কোরো।

তিন্নি, দাদার দিকটা তুমি জানো। আমার দিকটাও তোমার জানা দরকার। সেদিন দিঘির পাড়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম কেবল দাদার জন্য। দাদাও আসছিল। ওরা তখনও ওদিকটায় আসেনি। আমি তো অপেক্ষা করছিলাম। দাদা হয়তো পারতো আমাকে বাঁচাতে, শিউলি নিজেকে বাঁচাতে দাদাকে আটকাল। তুমি আমার দাদার নয় ওই শিউলির নাতিন যখন জানলাম আমার ভেতরের কালসাপটা ফোঁস করে উঠছিলো বারবার। হাজার হোক তুমি আমার দাদার খবর এনেছো তাই তোমাকে মারতে পারবো না। নিজেই সরে যাচ্ছি। নাহলে তোমার অবস্থা কাদের শেখের পরিবারের সকলের মতোই হতো।

সাবিনা, তোমার উপর আমার কোনো রাগ নেই। তোমার শরীরে কাদের শেখের রক্ত নেই। হাজার চেষ্টা করেও তোমার বর আর মেয়েটাকে মারতে পারিনি। যেদিন বনিকে শক লাগলো তারটা আমিই কেটেছিলাম। কিন্তু পারলাম না শেষটা দেখতে। মনে হলো কেবল শেখের নয় বিশ্বাস বাড়ির রক্ত-ও আছে ঐ শরীরে। ভেবেছিলাম সবাইকে শেষ করে এই বাড়ি আগলে পড়ে থাকব দাদার জন্য। আজ আর আক্ষেপ নেই।

আর একটা কথা। তোরঙ্গে আমার মায়ের সব গয়না আছে। তা বেচে যা টাকা হয় মহামায়া স্কুলকে দান কোরো। এ বাড়িটা ছেড়ে চলে যেও"।

১৯

তোরঙ্গ খুলে গয়না তো পাওয়া গেলো সঙ্গে পাওয়া গেলো আর-ও কিছু জিনিস। কারো বুঝতে অসুবিধা হলো না কাদের শেখ, কাদের শেখের মা বাবা, ভাই, বোন, বোনের ছেলের মৃত্যুগুলো কীভাবে হয়েছে। এত কৌশলে প্রতিশোধ নিয়েছে যে কারো মনে হয়নি মৃত্যুগুলো স্বাভাবিক নয়। দুবছর, তিনবছরের ব্যবধানে একটা করে মৃত্যু ঘটেছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক ছিলো সুবহানের পিসির পাঁচবছরের বাচ্চাটার মৃত্যু। মামারবাড়ি ঘুরতে এসেছিলো। ভরা দুপুরে দিঘিতে পড়ে যায়। সন্ধ্যায় বডি ভেসে ওঠে। আজ সবাই বুঝছে কে ঠেলেছিল।

কাজরি যে আদতে হিন্দু একথা নলশোধা গ্রামের কারো অজানা নয়। কিছুজন ঝামেলা করলেও দাহ করতে বিশেষ কিছু অসুবিধা হয়নি।

২০

একাদশীর দিনই ঝিলিক আর তিন্নিকে পুলিশ নিয়ে গেল ঢাকায়। ঝিলিকের বাবা পাঠিয়েছিলো। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার ছিলো তাই আরও চারদিন ওদের থাকতে হলো।

আজ পূর্ণিমার রাত। পুলিশের দুজন ঝিলিক আর তিন্নিকে বাসে তুলে দিয়ে গেলো।

সেদিনও পূর্ণিমা ছিলো। সেদিনও দুটো মানুষ দেশটা ছেড়েছিলো। ফারাক কেবল এটুকু সেদিন দুটো মানুষ ঘরছাড়া হয়েছিলো আজ দুটো মানুষ ঘরে ফিরছে।